STUDY MATERIALS FOR PLSA
SEMESTER-IV CORE COURSE-9
MODULE-1 TOPIC-3
FROM MR. VIVEKANANDA ROY
DEPARTMENT Of POLITICAL SCIENCE.

জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন

উদ্ভব।

জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন হল দ্বি- মেরু কেন্দ্রিক ঠান্ডা লড়াইয়ের দিন গুলিতে স্বাধীনতা প্রাপ্ত রাষ্ট্রসমূহের নিজস্ব জাতীয় স্বার্থ -ভিত্তিক বিদেশ-নীতি অনুসরণ করে চলার একটা মঞ্চ। এর দ্বারা কোন নিরপেক্ষতাকে বোঝানো হয় না। বরং উভয় মেরু থেকে সমদূরত্ব বজায় রেখে উভয়ের থেকেই জাতীয় স্বার্থ অনুসারে নিজ নিজ দাবি আদায়ের কৌশলকে বোঝায়। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর মস্তিষ্ক প্রসূত এই রকম মঞ্চের ধারণা মিশরের প্রেসিডেন্ট গামেল আব্দেল নাসের, ঘানার প্রেসিডেন্ট কুয়ামে নক্রুমা, ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট জেনারেল সুহার্তকে অনুপ্রাণিত করে এবং ১৯৫৫ সালে প্রথমে বান্দুং সম্মেলন করে নীতি সমূহ স্থির করা এবং পরে ১৯৬১ সালে যুগোস্লাভিয়ার বেলগ্রেড- এ ২৫ টি রাষ্ট্রের উপস্থিতিতেপ্রথম শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজন করে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন (Non-Aligned Movement) – এর প্রতিষ্ঠা ঘটানো হয়।

ধারণা।

জোট-নিরপেক্ষতা বলতে খুব সহজ কথায় বলতে গেলে দ্বি- মেরু বিশ্বের দুই মহা শক্তিধর মার্কিন জোট ও সোভিয়েত জোট, অর্থাৎ, পুঁজিবাদী উদারনৈতিক ও সমাজতান্ত্রিক – কোনটিতেই যোগ না দিয়ে উভয়ের সাথেই সম্পর্ক রেখে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারাকে বোঝায়।

জহরলাল নেহেরুর মতে, জোট- নিরপেক্ষতা হল স্বাধীনভাবে কাজ করার নীতি অনুসরণ ("Non-Alignment is a freedom of action which is part of independence")। আবার, নেতিবাচক অর্থে, জোট- নিরপেক্ষতা নিষ্ক্রিয় নিরপেক্ষতা নয়, পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক শিবির থেকে সমদূরত্ব বজায় রাখার নীতিও নয়। তাঁর মতে, যেখানে স্বাধীনতা বিপন্ন ও ন্যায়নীতি আক্রান্ত, সেখানে আমরা কখনোই নিরপেক্ষ থাকতে পারি না।

J.W. Burton বলেন, " The term Non-Alignment is commonly used to describe the foreign policies of nations which are not in an alliance with either the communist or the western bloc."

পাঁচটি নীতি।

১৯৬১ সালের জুন মাসে বিদেশ মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে জোট- নিরপেক্ষতার ৫ টি নীতি স্থির হয়:

ক) প্রত্যেক সদস্য দেশ শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও জোট- নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে স্বাধীন নীতি অনুসরণ করবে;

খ) প্রত্যেক সদস্য জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে সমর্থন করবে;

গ) কোনো সদস্য দেশ বৃহৎ শক্তিবর্গের বিরোধের পরিপ্রেক্ষিতে গঠিত কোনো সামরিক জোটের সদস্য হবে না;

ঘ) কোনো সদস্য নিজের দেশে অন্য কারো সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করতে দেবে না;

ঙ) যদি কোনো সদস্য দ্বি- পাক্ষিক বা আঞ্চলিক প্রতিরক্ষামূলক সংস্থার সদস্য থাকে, তবে সেই সংস্থার সদস্যপদ যেন বৃহৎ শক্তিবর্গের বিরোধের সাথেই জড়িত না থাকে।

এই সব নীতিগুলিকে একত্রিতভাবে পঞ্চশীল নীতি বলা হয়ে থাকে।

বৈশিষ্ট্য।

জোট- নিরপেক্ষ আন্দোলন- এর কতকগুলি বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করা যায়।

যেমন ---

1) জোট-নিরপেক্ষতা দুই মহা শক্তিধর জোটের কোনোটির অন্তর্ভুক্ত না হয়েও উভয়ের কাছ থেকে পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা আদায়ের কথা বলে।
2) জোট-নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ স্বেচ্ছামূলক; আইনগত বাধ্যবাধকতা এখানে থাকে না।
3) জোট-নিরপেক্ষতা যুদ্ধ বিরোধী অবস্থান গ্রহন ও শান্তি এবং সহযোগিতার স্বপক্ষে মত প্রকাশ করে।
4) জোট-নিরপক্ষতা পৃথিবীর সব দেশের উন্নতি ও সমৃদ্ধি কামনা করে।
5) জোট-নিরপেক্ষতা জোটবদ্ধতা বা নিঃসঙ্গতা কোনোটাই চায় না, বরং সহযোগিতার মধ্য দিয়ে সদস্য দেশগুলির দাবি আদায়ের পক্ষপাতী।
6) জোট-নিরপেক্ষতা রাজনৈতিক আদর্শের বিষয়ে উদারতা মেনে চলে।

গঠন কাঠামো।

A.N.Singham ও Shirley Hune রচিত 'Non-Alignment in an Age of Alignments’ শীর্ষক গ্রন্থে চিত্রিত জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলন-এর গঠন কাঠামোটি হল নিম্নরূপঃ

রাষ্ট্রপ্রধানদের শীর্ষ সম্মেলন

(প্রতি ৩ বছর অন্তর)

|

মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক

|

প্রবীণ আধিকারিকদের বৈঠক

| | |

বিদেশ মন্ত্রীদের বৈঠক। জোট-নিরপেক্ষতার সমন্বয় বৈঠক

(ষান্মাসিক পর্যায়ের) | কার্যনির্বাহী সংস্থা সমূহ

|

প্রবীণ আধিকারিকদের বৈঠক |

সমন্বয় ব্যুরো
(রাষ্ট্রদূত পর্যায়ের)
|
জাতিপুঞ্জে প্রতিনিধিত্বকারী
জোট-নিরপেক্ষ গোষ্ঠী
|
জোট-নিরপেক্ষ আঞ্চলিক গোষ্ঠীর বৈঠক
|
৭৭ গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা
|

জাতিপুঞ্জ ও তার সংস্থাগুলির সঙ্গে সমন্বয়মূলক কার্যাবলী

অবদান

ঠান্ডা লড়াইয়ের দিনগুলোতে ঔপনিবেশিক বন্ধনমুক্ত নতুন রাষ্ট্রসমূহ তৃতীয় বিশ্বের ধারণা সৃষ্টি করে এবং নিজেদের অবস্থান নিশ্চিত করতে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন এর মঞ্চ গঠন করে। সোভিয়েত জোটের অবসানের পরেও জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন তার অবস্থান অটুট রেখেছে এবং যথাযথ ভূমিকা পালন করে চলেছে। এই আন্দোলনের কয়েকটি অবদানকে চিহ্নিত করা যায়। যেমন—

ক) এই আন্দোলন তৃতীয় বিশ্বকে ঐক্যবদ্ধ করেছে ও আন্তর্জাতিক ব্যবস্হার বিশ্বায়নে সফল হয়েছে।

খ) উপনিবেশবাদের উচ্ছেদ সাধনে এই আন্দোলন তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন

করতে সক্ষম হয়েছে। নয়া-উপনিবেশবাদের ও তীব্র বিরোধিতায় দ্বিধা করেনি।

গ) বর্ণ বিদ্বেষী নিপীড়নের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে এই আন্দোলন। রোডেশিয়া, নামিবিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার মানুষের মুক্তিতে বড় ভূমিকা নিয়েছে।

ঘ) এই আন্দোলন তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন অর্থনৈতিক সমস্যার উপর আলোক-করে উন্নত বিশ্বকে ঐ সব সমস্যার সমাধান করতে চাপ সৃষ্টি করতে পেরেছে।

ঙ) দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতা সম্প্রসারণে সহায়তা করেছে।

পতনের কারণ।

বিভিন্ন কারণে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন তার গুরুত্ব হারায় এবং পতনের সম্মুখীন হয়। যেমন—

1) সোভিয়েত জোটের পতনের পর ঠান্ডা লড়াইয়ের অবসান ঘটলে এই আন্দোলন তার গতিশীলতা হারায়।
2) ঠান্ডা যুদ্ধোত্তর কালে যোগ্য নেতৃত্বের অভাব এর পতনকে ত্বরান্বিত করেছে।
3) সদস্য দেশগুলির মধ্যে বিরোধ ও যুদ্ধ এই আন্দোলনের ধার নষ্ট করেছে।
4) সদস্যদের মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা সম্প্রসারণে তেমন কোনো কর্মসূচি নিশ্চিত করতে না পারায় সদস্যরাও আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

প্রাসঙ্গিকতা।

ঠান্ডা যুদ্ধের অবসান জোটবদ্ধ আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে অপ্রাসঙ্গিক করে দিলে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন এর প্রাসঙ্গিকতা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে

শুরু করে। কিন্তু আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশেষজ্ঞগণের অনেকেই এই আন্দোলনের প্রাসঙ্গিকতাকে স্বীকার করে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলির অবতারণা

করেন। জাকার্তায় অনুষ্ঠিত জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের দশম শীর্ষ সম্মেলনে (১৯৯২) উপস্থিত চিনের দুই পরিদর্শক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশেষজ্ঞ Dr. Wan এবং Dr.Xiao এই অভিমত দেন যে, ঠান্ডা যুদ্ধোত্তরকালেও

জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলন আগের থেকে বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। তাঁরা আরও বলেন যে, বর্তমানে পশ্চিমি আধিপত্যের যৌথ হুমকির মোকাবিলা করতে পারে একমাত্র জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলন। তারা কৌশল অবলম্বনের

বিষয়ে বলেন যে, জোট নিরপেক্ষতার এখন যেটা দরকার সেটা হলো উন্নত দেশগুলির সঙ্গে সংঘর্ষে না গিয়ে তাদের মধ্যেকার দ্বন্দ্বকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করা। আবার, কার্তাজানাতে অনুষ্ঠিত একাদশ শীর্ষ সম্মেলনে উপস্থিত জাতিপুঞ্জের মহাসচিব ড. বুত্রোস গালি নিজ মত প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন যে, ঠান্ডা লড়াই ও দ্বিমেরুতার অবসান জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলনকে গুরুত্বহীন তো করেইনি, বরং এই আন্দোলনের সামনে একটি নতুন লক্ষ্য ও আদর্শকে তুলে ধরেছে।

উপসংহার।

তৃতীয় বিশ্বের ঐক্যবদ্ধতার লড়াইয়ে সৃষ্ট জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন বিভিন্ন জাতির স্বাধীনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সংরক্ষণ করা থেকে শুরু করে উপনিবেশবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও জাতি বিদ্বেষের অবসান ঘটানোসহ অস্ত্র প্রতিযোগিতা ও আণবিক মারণাস্ত্রের প্রসার রোধ এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাকে সীমিত করা ইত্যাদি সব মহান লক্ষ্যকে সামনে রেখে যে নির্জোট আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল, তা এখনও প্রাসঙ্গিকতার দাবি রাখে।